ছোটদের শাহ ইসমাইল

মাওলানা আখতার ফারুক

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটদের

শহীদ শাহ ইসমাঈল

আখতার ফারূক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটদের শহীদ শাহ ইসমাঈল
আখতার ফারূক

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৮৪১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২২.৯৭
ISBN : 984--06--0321--3

তৃতীয় (ইফাবা প্রথম) প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০২
মহররম ১৪১৬
জুন ১৯৯৫

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুর-উদ্-দৌলাহ্ পাহ্লোয়ান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা মাত্র

CHOTODER SHAHID SHAH ISMAIL (Life-Sketch of Shah Ismail for Children) : written by Akhter Farooq in Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. June 1995

Price : Tk 18.00 ; US Dollar : 1.00

facebook/@maktabatuttalamij

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ! প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ–সাহিত্যিক জনাব আখতার ফারূক রচিত 'ছোটদের শহীদ শাহ ইসমাঈল' শীর্ষক গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে প্রথমবারের মত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। উপমহাদেশের অন্যতম বিপ্লবী সংস্কারক শাহ ইসমাঈল শহীদ (র)–এর জীবনভিত্তিক এ বইটি ছোটদের উপযোগী ভাষায় লিখিত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের স্বপক্ষে সক্রিয় হতে এ গ্রন্থ সর্বজনকে উদ্বুদ্ধ করবে আশা করা যায়। গ্রন্থটি বড়দের জন্যও শিক্ষামূলক ভূমিকা পালনে দাবীদার।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সৎপথে চলার ও প্রয়োজনে শহীদী জীবনকে বরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

কেবল ব্যক্তিজীবনেই নয়, সমষ্টিগত জীবনে তথা রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার জন্য চাই বিশেষ অনুশীলন ও তাগিদ। সে অনুশীলন ও তাগিদের ক্ষেত্রে শাহ ইসমাঈল শহীদ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের ইতিহাসে তাঁর অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহ্লভীর অনুসারী হিসেবে শাহ ইসমাঈল শহীদ তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে উপমহাদেশে ইসলামের শাশ্বত আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অধ্যাপক আখতার ফারূক এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের ঘটনাবলীকে 'ছোটদের শহীদ শাহ ইসমাঈল' বইতে পরিবেশন করেছেন। পাঠকগণ বইটি থেকে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে প্রেরণা পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আমরা যাতে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হতে পারি আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই তৌফিক ইনায়েত করুন। আমীন!

facebook/@maktabatuttalamij

ভূমিকা

'শাসকবর্গের আদর্শই জনগণের আদর্শ' এ সত্য ভাষণটির ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে--অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বা কৃষ্টি-সভ্যতার বিকাশ ও বাস্তবায়ন নয়, বরং তার চরম বিলুপ্তিই ঘটে।

উপমহাদেশের শাসনক্ষমতাহারা মুসলিমদের নৈতিক ও আদর্শগত পতন দেখে সর্বপ্রথম যিনি এই সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি হচ্ছেন দিল্লীর খ্যাতনামা হাদীস বিশারদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মরহুম। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এই মহা সত্যটিকে কেন্দ্র করে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও সে আন্দোলন গন্তব্যের রাজপথ ধরে সামনে এগিয়ে চলেছিল! যাঁরা সে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন, শাহ ইসমাঈল শহীদ তাঁদেরই একজন।

এই বইয়ের প্রতিটি ছত্র শাহ ইসমাঈল শহীদেরই প্রকৃত পরিচয় এবং সত্যের জন্য, খিলাফতে রব্বানী প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর শাহাদত বরণের গৌরবময় কাহিনীর উজ্জ্বল স্বাক্ষর বয়ে চলেছে।

বাইরে আমরা 'ইসলাম' 'ইসলাম' বলে যত চিৎকারই দিচ্ছি না কেন, ভেতরটা একেবারেই ফাঁকা। বাইরে বাইরে ইসলামের আদর্শপ্রীতির যতই প্রদর্শনী চালাচ্ছি না কেন, ভেতরে ভেতরে ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতাই করছি। তাই যদি ন' হবে, তাহলে নবীন ও কিশোর-কিশোরীদের ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা না করে, সারা

facebook/@maktabatuttalamij

জীবনে 'ইসলামের আদর্শ' যাদের মন পেল না, আর যারা প্রায় মরতে বসছে–তাদের মুক্তির জন্য এত চিন্তিত ও ব্যস্ত হওয়া কেন? যে লতাটি বাঁকা হয়ে বড় হলো, সেটাকে সোজা করতে যত চেষ্টা–কসরতই হোক, ছাড়া পেলে বাঁকাই হবে।

ইসলামের মহান আদর্শের প্রতি যদি কারো বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠা বা প্রীতি থেকে থাকে, তাহলে তার মহৎ দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে কিশোর–কিশোরীদের মনে ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারা জাগিয়ে তোলা। মনে রাখতে হবে আজকের কিশোর–কিশোরীরাই আগামী দিনের নাগরিক, ভবিষ্যতের আশা–ভরসা, নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পাত্র। কাজেই আজ তাদের জীবন ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারায় গড়ে না উঠলে আসছে দিনে তাদের কাছ থেকে কী আশা করার থাকবে? এ ব্যাপারে যেমন অভিভাবক–অভিভাবিকাদের দায়িত্ব, তেমনি সুধীমহলেরও।

কিশোর মহলে ইসলামের ভাবধারা ও আদর্শ রূপায়ণের ব্যাপারে 'ছোটদের শহীদ শাহ ইসমাঈল' কিছুমাত্র সার্থক হলেও ধন্য ভাবব। বইটি কিশোরদের জন্য লেখা হলেও বয়স্করাও পড়ে উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি। বইটিকে আকারে ছোট, ভাষায় সরল ও গতিতে সাবলীল রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে, যেন তা এক নিশ্বাসে শেষ করার আগ্রহ জন্মায়।

'ছোটদের শহীদ শাহ ইসমাঈল' কিশোর–কিশোরীদের মনে দোলা লাগাক, সত্যের জন্য আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত বরণ তাদের জীবনাদর্শ হোক–এটাই একমাত্র প্রার্থনা।

লেখক

facebook/@maktabatuttalamij

সূচীপত্র

পূর্বাভাস	৯
পরিচয়	১১
শাহ্ সৈয়দ মিলন	১৪
হজ্জের সফর	১৫
জিহাদের আয়োজন	১৬
কান্দাহার গমন	১৭
কাবুল গমন	২০
ইসলামী হুকুমত	২১
জিহাদ ঘোষণা	২২
আকুড়ার লড়াই	২৩
হাজারা আক্রমণ	২৪
খলীফা নির্বাচন	২৫
শরীয়তী শাসন	২৬
হুতিমর্দানের যুদ্ধ	২৮
পেশোয়ার জয়	২৯
ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল	৩০
শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি	৩২
জয়যাত্রা	৩৩
বালাকোটের যুদ্ধ	৩৪
শাহ্ সৈয়দের মাযার	৩৭
শাহ সাহেবের মর্তবা	৩৮
চরিত্র	৩৮
শাহ্ সাহেবের শিক্ষা	৪০
গ্রন্থাবলী	৪২
সন্তান–সন্ততি	৪৪

facebook/@maktabatuttalamij

পূর্বাভাস

প্রায় দু'শ বছর আগের কথা। পাক–ভারতের বুক থেকে মুসলিম শাসন প্রায় বিদায় নিয়েছে তখন। সে বড় হৃদয়বিদারক ঘটনা। প্রায় হাজার বছর ধরে যে শাসন এদেশকে পরিচালিত করেছিল, এক বেনে জাতির হাতে তার অবসান ঘটল, তাও নিজেদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে।

মুসলমানদের হাত থেকে যে শুধু রাজত্বই গেল তা নয়, সাথে সাথে তাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি–সভ্যতা সবকিছু হলো ধূলায় লুণ্ঠিত। তাদের ভেতরে ধীরে ধীরে সব রকমের দুর্বলতা ও অন্যায় শিকড় গেড়ে বসল। যার ফলে বিশ্বের দরবারে তাদের মাথা তোলবার আর জো রইল না। আগে যে সময় ও শক্তি ব্যয় করত তারা জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তোলবার জন্য, তা তারা অপচয় করে চলল বংশীয় ও ধর্মীয় কোন্দলের ক্ষেত্রে। ধর্মের নামে তাদের ভেতরে দেখা দিল নানা ধরনের কুসংস্কার।

মুসলমানদের এরূপ নৈতিক অধঃপতনের সুযোগ নিল শত্রু জাতিগুলো। তারা তাদেরকে সব ক্ষেত্রেই করে চলল লাঞ্ছিত ও অবমানিত। মারাঠা, রাজপুত, শিখ প্রভৃতি গোত্র মুসলমানদের নাম–নিশানা ভারতের বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য উঠে–পড়ে লাগল।

যে যুগের কথা বলছি, সে যুগের শুরুতে উপমহাদেশের বুকে এক জগদ্বরেণ্য মনীষীর আবির্ভাব ঘটল। তাঁর নাম হযরত শাহ্

facebook/@maktabatuttalamij

ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী। তিনি এসে মুসলমানদের ভুলে যাওয়া ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিলেন। চেষ্টা করলেন তিনি তাঁদেরে আবার সেই কুরআন–হাদীসের অনুসারী সত্যিকারের মুসলমানরূপে গড়ে তুলতে। তার ফলে তন্দ্রাতুর মুসলমানদের ভেতরে নবজাগরণের ঢেউ খেলে গেল। অনেকেই পরে তাঁর মহান ব্রত জিইয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। তাঁর সুযোগ্য বংশধররাই এ ব্যাপারে ছিলেন সবার অগ্রণী। তাঁরা শাহ সাহেবের শিক্ষাদীক্ষা রাখলেন অব্যাহত। শাহ্ সাহেব ওয়াজ–নসীহত ছাড়াও বহু অমূল্য গ্রন্থ লিখে বিভ্রান্ত জাতিকে দিয়ে গেলেন সঠিক পথের সন্ধান।

শাহ্ সাহেবের চার পুত্র ছিল। বড় ছেলের নাম শাহ্ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহ্লভী। শাহ্ আবদুল কাদের, শাহ্ রফীউদ্দীন ও শাহ্ আবদুল গনী যথাক্রমে তাঁর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন একাধারে বিজ্ঞ আলিম, আল্লাহপ্রেমিক সাধক ও অশেষ বুযুর্গ মানুষ। জাতি–সংশোধনের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই যেন একটি পরশমণি ছিলেন। বহু পাপী মুসলমানকে তাঁরা সংশোধন করে বীর মুজাহিদরূপে গড়ে তুলেছিলেন।

এসব সাধক যখন একদিকে বিভ্রান্ত মুসলমানদের নৈতিক বল ফিরিয়ে আনার জন্য অক্লান্ত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অপরদিকে তখন অজ্ঞ ও অকেজো মোগল সম্রাটদের দুর্বলতার ফাঁকে শিখ ও মারাঠাগণ নিরীহ মুসলমান জনসাধারণকে পাইকারীভাবে হত্যা করে যাচ্ছিল ও তাদের সহায়–সম্পদ লুট করছিল। শুধু তাই নয়, তাদের মসজিদগুলোকে একে একে তারা মন্দিরে পরিণত করে চলল। পাঞ্জাবে তো শিখরা রাজত্ব কায়েম করে নিয়ে বর্বর হামলা চালালো

facebook/@maktabatuttalamij

মুসলমানদের ওপরে। মুসলমানদের অবাধে হত্যা করে তাদের মসজিদগুলোকে তারা আস্তাবলে পরিণত করল। মুসলমানরা আযান দিতে পারত না কোথাও, পারত না কখনও গরু জবেহ্ করতে। এরূপ নৃশংস অত্যাচার দেখে শাহ্ সাহেবের অনুগামীদের প্রাণ কেঁদে উঠল। তাঁরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করলেন এর প্রতিকারের জন্যে। তাঁদের ভিতরে দু'জনই ইতিহাসে সবচাইতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। একজনের নাম সাইয়েদ আহমদ শহীদ, অপরজন হলেন শাহ্ ইস্মাঈল শহীদ।

পরিচয়

আমরা এ বইতে শাহ্ ইস্মাঈল শহীদ সম্পর্কেই আলোচনা করব। তিনি ছিলেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র নাতি ও শাহ্ আবদুল গণীর ছেলে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটবর্তী ফলাত নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মাতার নাম ফজীলাতুন্নেসা ও নানার নাম মাওলানা আলাউদ্দীন মরহুম। ছোটবেলাতেই তিনি পিতৃহারা হন। চাচা শাহ্ আবদুল কাদের তাঁকে নিজ সন্তানের মত লালন-পালন করে বড় করেন। যৌবনে তাঁর সাথে নিজ কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তাঁকে ঘর-বাড়ি করে দেন।

বাল্যকাল হতেই শাহ্ ইস্মাইলের মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় ফুটে ওঠে। সাঁতার, ঘোড়দৌড়, তীরবাজী, অস্ত্র চালনা ও কুস্তি-লড়াইয়ে তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার। যমুনা নদী সাঁতরিয়ে পার হওয়া ছিল তাঁর কাছে নেহাত মামুলি ব্যাপার। এমনকি তিনি দিল্লী থেকে সুদূর আগ্রা পর্যন্ত অনায়াসে সাঁতার কেটে চলে যেতেন। ঘোড়া চালাতে

facebook/@maktabatuttalamij

তিনি এতই ওস্তাদ ছিলেন যে, ঘোড়ায় চড়ে একটানা কয়েক শ মাইল পার হয়ে যেতে তিনি আদৌ ক্লান্তি বোধ করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন।

তাঁর মেধা এতই প্রখর ছিল যে, পড়াশুনায় তাঁর বেশিদিন কাটাতে হয়নি। মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি ইসলামের সব রকমের শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করে ফেলেন। এ জন্য তাঁকে সেকালের বড় বড় আলিমরা পর্যন্ত যথেষ্ট সম্মান করতেন। জটিল সমস্যা তিনি এত সহজে সমাধান করে ফেলতেন যে, প্রবীণ ও বিজ্ঞ আলিমগণ তা দেখে থ' হয়ে যেতেন।

তাঁর এ যোগ্যতা শুধু ধর্মীয় শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমকালীন সব রকমের বিদ্যাতেই তাঁর গভীর দখল ছিল। তখনকার দিনে বাকশক্তিতে তাঁর সমকক্ষ উপমহাদেশে আর কেউ ছিল বলে জানা যায় না। আড়ম্বরহীন সিপাইর মত তিনি জীবন যাপন করতেন। জনসাধারণের সাথে অবাধে মেলামেশা করে তিনি ধর্মোপদেশ দিয়ে বেড়াতেন। গ্রামে গ্রামে জনসভা ডেকে ওয়াজ-নসীহত করে মানুষকে ধর্মপথে টেনে আনাই ছিল তাঁর প্রথম জীবনের কাজ। শুরুতেই বলে এসেছি যে, সে যুগের মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। রাজত্ব, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সভ্যতা সবই তারা হারিয়ে ফেলছিল। তাঁদের ধর্মও নিজরূপে রইল না। বিকৃত হলো তা নানা কুসংস্কার ঢুকে। ফলে যত অধর্মই চলতে লাগল ধর্মের নামে আর আসল ধর্ম রইল চাপা পড়ে। এমনি সময়ে তিনি দাদা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ও বাপ-চাচাদের মত শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে বেরোলেন মুসলমানদের হিদায়েত করতে। কিন্তু তাঁর হিদায়েতের

facebook/@maktabatuttalamij

ধারাটা ছিল একটু আলাদা ধরনের। শুরুতে তিনি মুসলমানদের ঈমান দুরস্ত করার কাজে লেগে গেলেন। কেননা, ঈমান ঠিক না হলে হাজার আমলও কোন কাজে আসে না। অপরাপর আলিমদের ধারণা এর বিপরীত। তাঁরা ঈমান ঠিক না করেই সকলকে আমল করার চাপ দেন। ফলে মানুষের আমল হয়ে দাঁড়ায় অন্তঃসারশূন্য। তাই তা বেশিদিন টিকে না। যে গাছের শিকড় নেই অথবা যা আছে তা দুর্বল, সে গাছ কতক্ষণ টেকে ?

তাই তিনি ইসলামের ভিত্তিমূল ঠিক করতে সচেষ্ট হলেন প্রথমে। এ জন্য তিনি সাধারণত এরূপ ওয়াজ করে বেড়াতেন ঃ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পুরোপুরি তাঁর নির্দেশ মেনে চল। ইহকাল ও পরকাল লাভের একমাত্র পথ এটাই। মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ও মর্যাদা ফিরে পাবার এটাই অদ্বিতীয় পন্থা। বর্তমান অবমাননা ও লাঞ্ছনার হাত থেকে নিস্তার লাভের তদবীর এই-ই। আল্লাহ্র কুরআন ও রসূলের হাদীসে নির্দেশিত আদর্শ ব্যতীত আর সবকিছুই মানুষের মনগড়া মত ও পথ। তাই আল্লাহ-রসূলের নির্দেশিত পথ ছাড়া আর সব বাতিল। আর সে বাতিল পথে চলতে গেলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। কেবলমাত্র আল্লাহ্ ও রসূলের পথেই মানুষ পেতে পারে তাদের আকাঙ্খিত শান্তি ও মুক্তি।

মোটকথা, মুসলমানদের ঈমান মজবুত করে তোলার জন্য তিনি ওয়াজ তো করতেনই; অধিকন্তু একখানা বিখ্যাত বইও লিখে গেছেন, যার নাম 'তাকভিয়াতুল ঈমান' বা ঈমানের দৃঢ়তা। ১৮৭৯

facebook/@maktabatuttalamij

খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এভাবে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে মুসলমান জাতিকে নবপ্রাণে উদ্বুদ্ধ করে চললেন।

শাহ্ সৈয়দ মিলন

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রায়বেরিলি থেকে সাইয়েদ আহমদ নামক জনৈক ব্যক্তি এলেন দিল্লীতে। তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বড় ছেলে শাহ্ আবদুল আজিজ দেহ্‌লভীর মুরীদ এবং শাহ্ আবদুল কাদেরের ছাত্র। তিনি একাধারে বুযুর্গ ও সৈনিক ছিলেন। মানুষকে শুধু তিনি হিদায়েত করেই ছেড়ে দিতেন না ; সাথে সাথে যুদ্ধবিদ্যাও শেখাতেন। আল্লাহ্‌র জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেন, তাঁদেরকে বলা হয় মুজাহিদ আর সে যুদ্ধকে বলা হয় জিহাদ। সৈয়দ সাহেব 'সিরাতুল-মুস্তাকীম' নামে একখানা বই লিখে মুসলমানকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। সে বইতে তিনি জিহাদ ও মুজাহিদদের মর্তবা সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দিল্লী এসে তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর ওস্তাদ শাহ্ আবদুল কাদের আর বেঁচে নেই এবং তাঁর ভাইপো শাহ্ ইস্‌মাঈল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সবাইকে ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা দান করে চলেছেন। সৈয়দ সাহেব স্বীয় বুযুর্গী ও মুজাহিদানা কার্যকলাপের দ্বারা ইতিমধ্যে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এর আগেও তিনি শাহ্ সাহেবের সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মাঝে দু'একবার দেখা-সাক্ষাতও ঘটেছিল। এবারে দিল্লী এলে স্বয়ং শাহ্ সাহেব তাঁর জামাতা মাওলানা আবদুল হাইকে সংগে নিয়ে গেলেন সাইয়েদ সাহেবের সাথে দেখা করতে। তাঁর সাথে দিল্লীতে সাক্ষাত করে

facebook/@maktabatuttalamij

তাঁরা খুবই আকৃষ্ট হলেন এবং পরে উভয়েই সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ হয়ে গেলেন।

হজ্জের সফর

শাহ্ আবদুল আজিজ তখনও বেঁচেছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শাহ্ ইস্‌মাঈল, মাওলানা আবদুল হাই ও সৈয়দ সাহেবকে সদলবলে হজ্জযাত্রার আয়োজনের জন্য নির্দেশ দিলেন। সবাই তদনুসারে সকল এলাকায় ঘুরে ঘুরে হজ্জযাত্রার সংবাদ প্রচার করতে লাগলেন। যে সব এলাকায় যাওয়া সম্ভবপর হলো না, সে সব এলাকায় চিঠিপত্রের মারফত হজ্জযাত্রার প্রস্তুতির জন্য জানিয়ে দিলেন। এভাবে শাহ্ সাহেবের সকল মুরীদানের ভেতরেই তাঁর হজ্জ গমনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। ফলে বহু মুরীদান তাঁর সংগে হজ্জে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

সাইয়েদ সাহেব কিছুদিন পরে স্বীয় আয়োজন সেরে নিবার জন্য রায়বেরিলি চলে এলেন। সেখান থেকে কোলকাতা এলেন হজ্জের প্রচারে। শাহ্ ইসমাঈল এবং মাওলানা আবদুল হাই দিল্লী ও অন্যান্য এলাকার মুরীদদের মধ্যে হজ্জ সম্পর্কে প্রচারকার্য চালালেন। এভাবে প্রচারকার্যের ফলে অবস্থা দাঁড়াল এই, শওয়াল মাসে চারশত স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের এক বিরাট কাফেলা রায়বেরিলি এসে জমায়েত হলো। সেখানে তারা রমযানের ঈদ পর্যন্ত অপেক্ষা করল। ঈদের নামায আদায় করে সে কাফেলা চলল সুদূর কোলকাতা। সেখানে হাজার হাজার লোক তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনমাস আগে থেকেই সেখানে মাওলানা আবদুল হাই ও শাহ্ ইসমাঈল অবস্থান

facebook/@maktabatuttalamij

করে ওয়াজ-নসীহত করে ফিরছিলেন। তাঁদের এই দীর্ঘ সংশ্রবে কোলকাতাবাসী ধন্য হয়েছিল। এবারে তাঁরা হজ্জযাত্রার উদ্যোগ করলেন।

এগারটি প্রকান্ড সমুদ্রগামী কিশ্‌তি বোঝাই হয়ে হজ্জযাত্রীরা চললেন জিদ্দার পথে। দীর্ঘ এগার মাসে তাঁদের সে সফর শেষ হলো। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁরা মক্কা শরীফে পৌঁছলেন। সেখান থেকে হজ্জব্রত শেষ করে পদব্রজেই চললেন তাঁরা পাক মদীনায়। মদীনায় তাঁরা পূর্ণ এক বছর রসূলে পাকের রওযা মোবারকে কাটিয়ে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জিদ্দা এসে জাহাজে চাপলেন। জিদ্দা থেকে জাহাজযোগে বোম্বাই আসতে তাঁদের পূর্ণ এক মাস লেগে গেল। বোম্বাই থেকে আবার কিশ্‌তিতে উঠলেন এবং এক মাস পরে এসে কোলকাতা পৌঁছলেন। শাহ্ ইসমাঈল ও সৈয়দ আহমদ তথায় আরও দু'মাস কাটিয়ে দীর্ঘ তিন বছর পরে তাঁরা দিল্লী ফিরলেন।

জিহাদের আয়োজন

হজ্জ থেকে ফিরেই সৈয়দ আহমদ ও শাহ্ ইস্‌মাঈল খুব জোরেশোরে জিহাদের জন্যে তৈরি হতে শুরু করলেন। শাহ্ সাহেব সারা দেশ একবার ঘুরে এলেন। বিভিন্ন স্থানে জিহাদের আবশ্যকতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে মুসলমানদের ভেতরে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুললেন। শুধু তাই নয়, তিনি দেশের সর্বত্র ব্যক্তিগত প্রতিনিধি প্রেরণ করে জিহাদ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করলেন। তিনি নিজে দিল্লীর জামে মসজিদে প্রতি শুক্রবার এবং মংগলবার জিহাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। দূর-দূরান্তর থেকে

facebook/@maktabatuttalamij

হাজার হাজার মুসলিম জনতা তাঁর সে মূল্যবান ও ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনতে জামে মসজিদে এসে সমবেত হত। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে তিনি আকবরাবাদ মসজিদে ওয়াজ করতেন। সেখানে তিনি মুসলিম জনসাধারণকে ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দিতেন।

সাইয়েদ সাহেব স্বয়ং আকবরাবাদ মসজিদের হুজরায় অবস্থান করতেন। তাঁদের উভয়ের অবিরাম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু মুসলমান তাঁদের সংগী হলো। কিন্তু কতক ভ্রান্ত মৌলভী, ভন্ড পীর ও দরগা–পূজারী তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। কেননা সেসব লোক ধর্মের নামে অন্ধ জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে অর্থ লুটে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। সে ক্ষেত্রে শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেবের দ্বারা ইসলামের সত্যিকারের রূপ প্রকাশ পাওয়ায় ভন্ডদের রুজি–রোজগার বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। তাই স্বভাবতই তারা শাহ্–সৈয়দ জোটের উপর তেলে–বেগুনে চটে উঠল। কিন্তু তাদের সে হৈ–হুল্লোড় বেশিদিন টিকে নি। মিথ্যার বেসাতি আর কদিন চলে? শাহ্ ইসমাঈলের অনুগামী দিন দিন বেড়ে চলল। স্বেচ্ছায় দলে দলে লোক এসে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত পথে চলবার জন্য শাহ সাহেবের হাতে বায়েত হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে জামে মসজিদ ও আকবরাবাদ মসজিদে এত ভিড় জমে উঠল যে, ঈদের জামাতেও এত লোকের ভিড় খুব কমই দেখা যেত।

কান্দাহার গমন

শাহ্ ইসমাঈল যখন বুঝতে পারলেন যে, এদেশের মুসলমানদের ভেতরে জিহাদের বেশ প্রেরণা দেখা দিয়েছে, তখন

facebook/@maktabatuttalamij

সৈয়দ সাহেবের সংগে মিলে তিনি এ দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললেন। মুসলমানদের প্রধান শত্রু ছিল তখন তিনটি জাতি। ইংরেজ, মারাঠা ও শিখ। শাহ্ ইসমাঈল এ তিন জাতির খপ্পর থেকে মুসলমানদের মুক্ত করে এক স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কিন্তু সকল শত্রুর সাথে তো আর একই মুহূর্তে লড়াই করা সম্ভবপর নয়? কেননা, তাঁরা জিহাদের জন্য কিছু লোক জুটিয়েছেন মাত্র। তাঁদের না ছিল অর্থ, না অস্ত্র। শুধুমাত্র জনবল দিয়ে কি করে তিনটি শক্তির সাথে একই সাথে লড়তে যাবেন? তাই তাঁরা ভেবে-চিন্তে ঠিক করলেন যে, একটির পর একটি করে শত্রুদেরকে ঘায়েল করতে হবে এবং একবারে শুধু একদলের বিরুদ্ধেই তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে যেখানে মুসলমানদের ওপর বেশি নিপীড়ন ও নির্যাতন চলছিল, সেখানে তাঁরা প্রথমে হস্তক্ষেপ করলেন। পাঞ্জাবে শিখ সরকার তখন মুসলমানদের উপর চালাচ্ছিল অমানুষিক অত্যাচার। সেখানে শিখদের পৈশাচিক দৌরাত্ম্যে মুসলমানদের পক্ষে প্রাণে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি নিজে ভেবে-চিন্তে এবং অন্যান্য চিন্তাশীল নায়কদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে স্থির করলেন যে, সকল মুজাহিদকে সীমান্তের কোন এক এলাকায় এনে জমায়েত করা হবে। তারপর পাঞ্জাবের মুসলমান নেতাদের সাথে মিলে একযোগে শিখদের ওপর আক্রমণ চালানো হবে। আল্লাহ্ সহায় হলে পাঞ্জাব জয় করে নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করা হবে।

facebook/@maktabatuttalamij

তদনুসারে কাজ শুরু হলো। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে শাহ্ ইসমাঈল এবং তাঁর পীর সৈয়দ আহমদ কান্দাহার রওয়ানা হলেন। শুধুমাত্র দিল্লী থেকেই তাঁদের সংগে চলল বার হাজার মুজাহিদ। তাঁদের ভেতরে তখন এরূপ উত্তেজনা বিরাজ করছিল যে, পাক–ভারতের বুকে পুনর্বার ইসলামের বিজয় কেতন ওড়াবার জন্য তাঁরা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে উদগ্রীব হয়ে উঠল। দিন দিন হু হু করে তাঁদের সংখ্যা বেড়ে চলল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, রাজপুতনা প্রভৃতি ভারতের সকল প্রদেশ থেকে পংগপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মুজাহিদ এসে তাঁদের ইসলামী ঝান্ডার নিচে সমবেত হতে লাগলো। দেখতে দেখতে তাঁদের সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে গেল।

শাহ্ ইসমাঈল, সাইয়েদ আহমদ ও আবদুল হাইয়ের পরিচালনাধীন এই বিরাট মুজাহিদ বাহিনী থানেশ্বর, মালীর কোট, বাওয়ালপুর, হায়দরাবাদ, সিন্ধু, শিকারপুর, ঢাডর ও বোলান পার হয়ে গিয়ে কান্দাহার পৌঁছল। পথিমধ্যে আরও কয়েক হাজার মুজাহিদ এসে তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ বিলাবার জন্য মুসলিমরা যেন পাগল হয়ে উঠল।

শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেবের আশা ছিল যে, কান্দাহারের মুসলমান শাসনকর্তা অবশ্যই তাঁদের এ মহৎ অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। আর না হোক সেখানে তাঁদের থাকবার অনুমতি তো দেবেনই। তাঁদের এরূপ আশা করা খুবই স্বাভাবিক ও সংগত ছিল। কেননা, শাহ্ ও সৈয়দ সাহেবের ওয়াজ শুনে সেখানকার পাঠান মুসলমানরা সবাই জিহাদের জন্য উদগ্রীব

facebook/@maktabatuttalamij

হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কান্দাহারের শাসনকর্তা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা তো দূরের কথা, এমনকি তাঁদেরকে অনতিবিলম্বে তাঁর এলাকা ছেড়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। শাহ্ সাহেব ও সাইয়েদ সাহেব তথায় পৌঁছলেন মাত্র চারদিন হলো। এর মধ্যেই কান্দাহারের শাসনকর্তার দূত এসে তাঁদের কাছে পত্র দিল। তাতে লেখা ছিল "আপনারা পত্র পাওয়া মাত্র আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন।"

সত্যের পথে বিপদ অনেক। আপনও তখন পর হয়ে যায়। তাছাড়া মুসলমান শাসনকর্তাদের ভেতরে ছিল চরম দুর্বলতা। তা না হলে হাজার বছরের তৈরি সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থা এক বেনে জাতির সামান্য ধাক্কায় মিসমার হবে কেন? নৈতিক বল বলতে মুসলমান শাসকদের অন্তরে কিছুই ছিল না। আরাম-আয়েশের হেরেমের জিন্দেগী তাদের ভোগ-বিলাসে ডুবে থেকেই কেটে যেত।

যাক্, অগত্যা শাহ্-সৈয়দ বাহিনী কান্দাহার ত্যাগ করে চলল। তাঁদের সাথে গোপনে সেখানকার তিনশত পাঠান মুজাহিদ যোগ দিল। যদিও তাদের ওপর সরকারের কড়া নির্দেশ ছিল যে, কেউ যেন আর শাহ্-সৈয়দের বাহিনীতে যোগ না দেয়। তা হলে কঠোরভাবে তাকে দণ্ডনীয় হতে হবে।

কাবুল গমন

কান্দাহারের শাসনকর্তা থেকে হতাশ হয়ে তাঁরা কাবুলের বাদশার নিকট গেলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে আরেক নতুন সমস্যা দেখা দিল। সেখানকার পাঠান সর্দারদের ভেতরে চলছিল তখন

facebook/@maktabatuttalamij

ভয়ানক অন্তর্বিরোধ। অথচ এই অন্তর্বিরোধই ভারতের বুক থেকে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেব মাঝে পড়ে তাঁদের ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ করবে কে? যে স্বার্থপরতা বিজয়ী মুসলমানদের বিজিত দাস জাতিতে পরিণত করে ছাড়ল, সে স্বার্থপরতা তখনও তারা ভুলতে পারল না। অগত্যা শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেব ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কাবুল ত্যাগ করলেন এবং সেই বিরাট বাহিনী নিয়ে খাইবার গিরিপথে পেশোয়ার সীমান্ত পার হয়ে এসে পাঞ্জাব সীমান্তে প্রবেশ করলেন।

ইসলামী হুকুমত

সেকালে সীমান্ত এলাকাও পাঞ্জাবের আওতাধীন ছিল। শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেব সসৈন্যে কিছুদিন পেশোয়ারের নিকটস্থ হাশ্ত নগরে অবস্থান করলেন। সেখান থেকে মুজাহিদদের ভালরূপে জিহাদের নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে নিলেন। ইত্যবসরে ইউসুফ-জায়িদের পার্বত্য এলাকায় এসে পাঞ্জাবের সর্দারগণ তাদেরে পাঞ্জাব যাওয়ার জন্য আহবান জানালেন। মুসলিম মুক্তিকামী বাহিনী তাদের আক্রমণক্রমে পাঞ্জাব রওনা হলো।

পথিমধ্যে ডাকী নামক স্থানে সৈয়দ সাহেব কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করলে বহু মুসলমান তাদের দর্শন লাভের জন্য হাযির হলো। সৈয়দ সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে জিহাদ সম্পর্কে এক তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা দান করলেন। সে বক্তৃতা শুনে সংগে সংগে সেখানকার দু'শ আলিম তাঁর হাতে বায়েত গ্রহণ করলেন। এর পরে

facebook/@maktabatuttalamij

তাঁরা সবাই মিলে যখন পাঞ্জাব পৌঁছলেন, সেখানকার সর্দাররা জানালেন তাঁদেরকে বিপুল সম্বর্ধনা। শুধু তাই নয়, তাঁরা সেখানে সৈয়দ সাহেবের নেতৃত্বে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করলেন। আর সেখানকার হাজার হাজার অধিবাসী এসে যোগ দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের দলে। তথাকার সব সর্দাররা শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেবের এত ভক্ত সাজলেন যে, যে কোন মুহূর্তে তাঁদের ইংগিতে তারা প্রাণ দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত রইলেন।

জিহাদ ঘোষণা

মুজাহিদদের এ বিরাট আয়োজন ও পাঞ্জাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কথা শুনে শিখরাজ রণজিৎ সিংহের তো চক্ষুস্থির। শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেব ইতিমধ্যে এসে নওশোহরা নামক স্থানে ছাউনি গাড়লেন। প্রথমে তাঁরা রণজিৎ সিংহের নিকট দূত মারফত এই মর্মে পত্র লিখে পাঠালেনঃ তুমি পবিত্র ইসলাম কবূল কর। মনে রেখ ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর–জবরদস্তি নেই। এ অবস্থায় যদি তোমার ইসলাম গ্রহণে আপত্তি থাকে তা হলে আমাদের আনুগত্য মেনে নিয়ে কর দিতে রাযী হও। সে কর তোমাদের নিরাপত্তা বিধানের কাজেই লাগানো হবে। যদি তাতেও রাযী না হও, তা হলে যুদ্ধের জন্য তৈরি হও। আমরা তোমাদের যে কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে প্রস্তুত আছি। স্মরণ রেখ, আমাদের কাছে শহীদ হওয়া তোমাদের মদ্যপানের চেয়েও প্রিয়।

ইসলামী হুকুমতের তরফ থেকে জিহাদ ঘোষণার নিয়ম এটাই। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এভাবেই জিহাদের ঘোষণাপত্র বিপক্ষ শিবিরে দূত মারফত পাঠানো হত।

facebook/@maktabatuttalamij

জনৈক দূতের মারফত যখন এ চিঠি রণজিৎ সিংহের কাছে পাঠানো হলো, দাম্ভিক রণজিৎ সিংহ তার কোন লিখিত জওয়াব তো দিলই না, অধিকন্তু ইসলামী হুকুমতের দূতকে তার দরবার থেকে অপমান করে বের করে দিল। অথচ এভাবে রাজদূতকে অপমান করা সব যুগেই নিন্দনীয় ও অমার্জিত অপরাধ বলে গণ্য হয়ে আসছে।

আকুড়ার লড়াই

রণজিৎ সিংহ ছিল নিতান্ত দাম্ভিক ও অত্যাচারী শাসক। তাই শাহ্-সৈয়দ সরকারের পত্রের জওয়াবে সে তার আত্মীয় বুধ সিংকে দশ হাজার সৈন্যসহ 'ইসলামী হুকুমত' দখল করতে পাঠাল। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে নওশোহ্রা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী আকুড়া নামক স্থানে উভয় দলের মুকাবিলা হলো।

যুদ্ধের আগের দিন খাটক গোত্রের সর্দার আমীর খান মুজাহিদ নেতাকে খবর দিল যে, বুধ সিং 'সমাস' এলাকায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাকে লুন্ধা নদী পার হতে না দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তাই রাতারাতিই তার বাহিনীর উপর হামলা করা উচিত।

আমীর খানের পরামর্শ অনুসারে মুজাহিদগণ সে রাতেই গিয়ে বুধ সিং-এর বাহিনী আক্রমণ করল। এ অতর্কিত আক্রমণে শিখরা শোচনীয়রূপে পরাজয় বরণ করল। কয়েক হাজার শিখ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গেল। বাকি সব কোনমতে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাল। বুধ সিং নিজে পাশের এক গাঁয়ে গা ঢাকা দিয়ে কোন প্রকারে বেঁচে গেল।

facebook/@maktabatuttalamij

এ শোচনীয় পরাজয় বুধ সিং–এর প্রাণে দারুণ অনুশোচনার সৃষ্টি করল। সে আরও কিছু সৈন্য রাতারাতি জমা করে পরদিন সকালে আবার মুসলমানদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালাল। মুজাহিদরা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। ‘আল্লাহু আকবর’ জয়ধ্বনি দিয়ে তারা শত্রুর মুকাবিলায় রুখে দাঁড়াল। ফলে বুধ সিং এবারে অধিকতর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাল। এ বিজয় মুসলমানদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তুলল।

হাজারা আক্রমণ

আকুড়ার যুদ্ধে জয়লাভ করায় মুজাহিদদের শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। জোয়ারের নৌকায় সবাই বাদাম ওড়াতে চায়। দলে দলে পাঠান নেতারা এসে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিল। ‘হুন্দ’ দুর্গের অধিপতিও এসে সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়েত গ্রহণ করলেন। আকুড়া বিজয়ের পরেই তিনি শাহ্ ও সৈয়দ সাহেবদের সাথে এসে দেখা করলেন এবং পরামর্শ দিলেন, “হাজারা শিখদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। ওটা আক্রমণ করে জয় করা দরকার। তা হলে একদিকে শিখদের নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয় ঘটবে, আর আমাদের আর্থিক শক্তি বেড়ে যাবে অশেষ।”

সৈয়দ সাহেব আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতে নেমেছেন। তিনি এরূপ লুটতরাজে অংশগ্রহণ করতে রাযী হবেন কেন? তাই হুন্দ–শাসককে তার দলবল নিয়ে সেই কাজ সমাধা করতে বললেন এবং কোন মুজাহিদকেই তার সংগে যেতে অনুমতি দিলেন না। কেননা, তিনি চান না যে, মুজাহিদদের ভিতরে একমাত্র খোদাপ্রীতি ও

facebook/@maktabatuttalamij

শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন অন্য কোন পার্থিব লালসা জাগরূক হোক।

যাক, হুন্দ অধিপতি 'হাজারা' আক্রমণ করে বসল। শিখরা বহু চেষ্টা করেও শহর রক্ষা করতে পারল না। হুন্দ অধিপতি যুদ্ধে জয়লাভ করে বহু অর্থ–সম্পদ লুটে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

খলীফা নির্বাচন

আকুড়া জয়ের কিছুদিন পরে পাঞ্জাব ও নওশোহরের বাসিন্দারা মুজাহিদদের সাথে মিলে এক বিরাট অধিবেশনে সৈয়দ সাহেবকে ইসলামী হুকুমতের খলীফা বা আমীরুল মু'মিনীন নির্বাচিত করল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার সর্বপ্রথম তাঁর নামে খোতবা পাঠ আরম্ভ হলো। সেদিন তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি প্রচার করেন। তাতে তিনি সব মুসলমানকে দলে দলে এসে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়ে শিখদের সাথে জিহাদ করার জন্য আহবান জানান। বলা বাহুল্য, শাহ সাহেব হলেন তাঁর প্রধান উযীর ও সিপাহ্সালার।

আনুষ্ঠানিকভাবে 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যারা সৈয়দ সাহেব ও শাহ্ সাহেবের শত্রু ছিল, তাদের সামনে দু'টি পথ খোলা ছিল। হয় শিখদের সাথে যোগ দেয়া, নতুবা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে ঘায়েল করা। তারা তাই করল। একদল গিয়ে সোজাসুজি শিখদের সাথে যোগ দিয়ে আপন মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তরবারি ধারণ করল। আরেক দল গোপনে মুজাহিদ দলে ঢুকে পড়ে স্বজাতিকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বংস করার জন্য

facebook/@maktabatuttalamij

বদ্ধপরিকর হলো। বলা বাহুল্য, এসব 'মীরজাফররাই' যুগে যুগে জাতিকে ধ্বংসের অতল তলে ডুবিয়ে দিয়েছে।

তাদের দলের আলিম সম্প্রদায়টি বাইরে থেকে শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করতে লাগল। তারা জনসাধারণকে এই বলে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করল, "সর্বনাশ! সৈয়দ আহমদ নাকি আমিরুল মু'মিনীন সেজেছে। তার নামে আবার খোত্‌বা পাঠ হচ্ছে। হায়, হায়! কি জঘন্য কথা! ইসলাম একেবারেই রসাতলে গেল।" এমনি আরও অনেক কুৎসা তারা সৈয়দ সাহেব ও শাহ্ সাহেবের বিরুদ্ধে রটিয়ে চলল।

এতদিনে শাহ্ সাহেব আবার কলম ধরলেন। এক হাতে অসি রেখে আর হাতে মসিযুদ্ধ শুরু করলেন। 'মনছবে এমামত' অর্থাৎ 'নেতৃত্বের পদ' নামে তিনি একটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে সবাইকে হতবাক করে দিলেন। উপমহাদেশের সকল আলেমই এ বই পড়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং বলতে বাধ্য হলেন, যুদ্ধের ময়দানে বসে এরূপ অমূল্য রচনা কেবলমাত্র শাহ ইসমাঈলের দ্বারাই লেখা সম্ভব।"

সে বইতে শাহ্ সাহেব দেখিয়েছেন যে, মুসলমানদের খলীফা বা ইমাম হওয়ার জন্যে পাঁচটি গুণ থাকা শর্ত। (১) মর্যাদাবান হওয়া (২) নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়া (৩) নির্দিষ্ট দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করা (৪) হাদী বা পথ প্রদর্শক হওয়া (৫) বিজ্ঞ রাজনীতিবীদ হওয়া । এক কথায় রসূলে পাক ও খুলাফায়ে রাশেদিনের ভেতরে যেরূপ সর্ববিধ গুণের সমন্বয় ঘটেছিল, কম ও বেশি তদ্রূপ হওয়া। কেননা, খলীফা অর্থ উত্তরাধিকারী। তবে

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লাহ্‌র খলীফাদের বলা হয় নবী বা রসূল আর নবীদের খলীফাদের বলা হয় খলীফা, আমীর বা ইমাম। নবীর খলীফাদের ভেতরে অবশ্যই নবীর গুণাবলী মোটামুটিভাবে থাকবে। সেক্ষেত্রে সৈয়দ সাহেবের মত সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যই মুসলমানদের খলীফা হবার যোগ্যতা রাখেন।

শরীয়তী শাসন

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মুজাহিদরা যা কিছু করত আল্লাহ্‌র জন্যই করত। দুনিয়ার ধন–দৌলত বা ভোগবিলাসের লালসা তাদের ভেতরে আদৌ ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দীন ইসলামের বিজয় কেতন আবার পাক–ভারতের আকাশে উড্ডীন করা। তাদের আশা ছিল, এ পথে মরণ বরণ করলে তারা শহীদ হবে। ফলে বিনা হিসাবে সোজাসুজি তারা বেহেশতে চলে যাবে। আর বাঁচলে হবে গাযী। তাতে স্বজাতির কাছে পাবে তারা অশেষ মর্যাদা। মোটকথা, তাঁরা স্বয়ং আল্লাহ্‌র সৈন্য বিভাগে নাম লিখিয়েছেন। তাই তাদের দেনা-পাওনা সব আল্লাহ্‌র সাথে। তাদের কাজ হলো আল্লাহ্‌র শান ও আল্লাহ্‌র রাজত্ব ঠিক রাখা।

তাই আমরা দেখতে পাই যে, পাঞ্জাবে মুজাহিদরা যে রাজত্ব কায়েম করল, তা হলো পূর্ণ ইসলামী হুকুমত। আল্লাহ্‌র শরীয়ত বা আইন অনুসারেই চলবে সেখানকার সব বিচার–আচার ও কার্যকলাপ। এই 'ইসলামী হুকুমত'ই কায়েম করেছিলেন আমাদের পেয়ারে রসূল (সা) আর তাঁর চার আসহাব বা খুলাফায়ে রাশেদীন। তারপর থেকে যে মুসলমানরা সেই আল্লাহ্‌র রাজত্বকে নিজের

facebook/@maktabatuttalamij

রাজত্বে পরিণত করল তা ঠিক হলো না। অবশ্য মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌র দু'একজন বান্দা এসে 'ইসলামী হুকুমত' বা আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করতেন। কিন্তু তাঁদের পরেই আবার সেটা বান্দার রাজত্বে পরিণত হত। সৈয়দ সাহেব উপমহাদেশের বুকে সম্রাট আলমগীরের পরে আবার সেই 'ইসলামী হুকুমত' কায়েম করলেন। সেখানে আবার ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফের শাসন কায়েম হলো। রোযা-নামায ইত্যাদি ইসলামের ফরয কাজ অবহেলাকারীকে দণ্ড দেয়া হত। শরীয়তের বিধান অনুসারে সকল মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালা করা হত। সমাজের ভেতরে যতরকমের কুসংস্কার ছিল, ধীরে ধীরে সব আইনের মাধ্যমে রহিত করা হলো। এক কথায়, শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেব খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের নমুনা আরেকবার দুনিয়াবাসীকে দেখালেন।

হুতিমর্দানের যুদ্ধ

সৈয়দ সাহেব ইসলামী হুকুমতের আমীর নির্বাচিত হবার পরে একদিন এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। সেখানে তিনি সকল মুসলমানকে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী চলতে ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বর্জন করতে আহ্‌বান জানান। সমবেত জনতা একযোগে হাত তুলে সৈয়দ সাহেবের আহবানে সাড়া দিল এবং আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত আদর্শে জীবন গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। সেখানে হুতিমর্দানের শাসনকর্তা আহমদ খানকে ডাকা হয়েছিল। সে ছিল কিছুটা দাম্ভিক প্রকৃতির ফাসিক। তাই সে সৈয়দ সাহেবের আহবানে সাড়া দিল না। সে স্বীয় রাজ্য ছেড়ে

facebook/@maktabatuttalamij

পেশোয়ার চলে গেল ; তবু মুসলমান হয়ে ইসলামের শাসন মানতে পারল না। ধিক!

পেশোয়ার গিয়ে সে চুপ করে বসে রইল না। সেখানকার দুররানী পাঠান ও শিখদের সাথে মিলে ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। শাহ্ ইসমাঈল তা টের পেয়ে সসৈন্যে গিয়ে হুতিমর্দান আক্রমণ করলেন। আমীর আহমদ খানের সুসজ্জিত সৈন্যদল প্রাণপণে তাদেরে বাধা দিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। অবশেষে আল্লাহ্‌র ফৌজই জয়ী হলো। আহমদ খানের বাহিনী পরাজিত ও বিপর্যস্ত হলো। শাহ সাহেব হুতিমর্দানে ইসলামী হুকুমতের ঝাণ্ডা উড়ালেন। সেখানেও সেই হুতি ইসলামী শাসন প্রবর্তিত হলো।

পেশোয়ার জয়

শাহ ইসমাঈল ও সৈয়দ সাহেব যখন পাঞ্জাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন, তখন পেশোয়ারের শাসনকর্তা ছিল ইয়ার মোহাম্মদ খান নামে এক পাঠান। শিখদের সাথে ছিল তার যথেষ্ট যোগাযোগ। কাবুলের শাসনকর্তার সাথেও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। মুজাহিদদের পাঞ্জাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিকে সে আদৌ সুনজরে দেখে নি ; বরং তাতে মনঃক্ষুণ্ণই হয়েছিল। তারপর তারা যখন আকুড়া জয় করল, তখন তো সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে, মুজাহিদদের অধিকৃত এলাকাগুলো জয় না করে আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে না। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে তার সে স্বপ্নসাধ আকাশ কুসুমে পর্যবসিত হলো। তার বন্ধু শিখরাজ ও

facebook/@maktabatuttalamij

কাবুলরাজের মিলিত চক্রান্তে তাকেই রাজত্ব হারাতে হলো। শিখরাজ রণজিৎ সিং ও কাবুলরাজ দোস্ত মুহাম্মদ খান মিলে তাকে বিতাড়িত করে তার ছোট ভাই সুলতান মুহাম্মদকে পেশোয়ারের সিংহাসনে বসাল। সে শিখদের বশ্যতা স্বীকার করল এবং তাদেরে কর দিতেও স্বীকৃত হলো। সিংহাসনে বসে সেও ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে শিখদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

যথাসময় শাহ্ সাহেব তা টের পেয়ে গেলেন এবং সৈয়দ সাহেবকে নিয়ে সসৈন্যে পেশোয়ার আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তদনুসারে মুজাহিদরা সৈয়দ সাহেব ও শাহ সাহেবের নেতৃত্বে গিয়ে পেশোয়ার আক্রমণ করল। পাঠান ও শিখদের মিলিত শক্তি মুজাহিদদের বাধা দান করল। কিন্তু, আল্লাহ্র দলের গতিরোধ করতে পারল না তারা। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে মুজাহিদরা বিপক্ষ দলকে ভীষণভাবে পরাজিত করে পেশোয়ার জয় করল। সুলতান মুহাম্মদ কোনমতে প্রাণ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাল।

ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল

পেশোয়ার জয় করে মুজাহিদরা তথায় ইসলামী শাসন প্রবর্তন করল। মুসলমানরা আবার পূর্ণোদ্যমে ইসলামের বিধান পালন করতে লাগল। নামায, রোযা সবাই মিলে মহানন্দে করে চলল। তা শেখাবার জন্য সরকারের তরফ থেকে সর্বত্র লোক নিয়োগ করা হলো। দুস্থ ও গরীবদের খাবার-পরার ব্যবস্থা হলো রীতিমত। বিলাসী ও অত্যাচারী ধনবানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলবার ব্যবস্থা হালা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদল পাপী মুসলমান এ সব

facebook/@maktabatuttalamij

সহ্য করতে পারল না। অধিকন্তু তারা ইসলামী হুকুমতের বিলোপ সাধনের জন্য মীরজাফরের পথ অনুসরণ করল। গোপনে তারা শিখদের সাথে ষড়যন্ত্র করে নিজেদের জাতীয় সরকারকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হলো।

এদিকে ভাগ্যাহত সুলতান মুহাম্মদ পুনরায় পেশোয়ারের সিংহাসন দখল করার জন্য এক নতুন ফন্দী আটল। সে পেশোয়ারে ফিরে এসে সৈয়দ সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং তাঁর হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করল যে, তাঁর উপদেশমতেই সে আজীবন চলবে।

সৈয়দ সাহেব সরলপ্রাণ মুসলমান। তিনি সুলতান মুহাম্মদের চাল বুঝবেন কি করে? তাই তিনি তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে পুনরায় পেশোয়ারের শাসনভার দান করলেন। কথা রইল সে ইসলামী হুকুমতের আওতাধীন থেকে দেশে ইসলামী শাসন জারি রাখবে। এই বলে সৈয়দ সাহেব নির্দিষ্ট কয়েকজন সংগী সেখানে রেখে পাঞ্জাব চলে এলেন। বস্তুত, সৈয়দ সাহেবের এই সরল বিশ্বাসই ইসলামী হুকুমতের কাল হলো।

সুলতান মুহাম্মদ কিছুদিন নীরব রইল। মনে হলো সত্যি সে সৈয়দ সাহেবের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। তাই সৈয়দ সাহেবের সংগীরা তার প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখার তেমন কোন প্রয়োজন মনে করল না। সহসা একরাত্রে সুলতান মুহাম্মদ সৈয়দ সাহেবের নিয়োজিত সকল সংগীকে ঘুমের ভেতরে অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা শহীদ করে দিল। শুধু তাই নয়, সংগে সংগে সে পাঞ্জাবের ইসলামী সরকারের অধীনতা অস্বীকার করে বসল।

facebook/@maktabatuttalamij

এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পেশোয়ার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় মুজাহিদরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সুলতান মুহাম্মদ কর্তৃক পেশোয়ার পুনঃ অধিকৃত হওয়ায় শিখদের শক্তি ও সাহস বেড়ে গেল। কেননা সুলতান মুহাম্মদ তো তাদেরই পোষ্যপুত্র মাত্র।

শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি

যে কেউ আজ শুনে অবাক হবে যে, মুসলমানরা কি করে ইসলামী হুকুমতের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজাতির সাথে ষড়যন্ত্র করতে পারে! অবশ্য এখনও আমরা স্বচক্ষে তা দেখতে পাই। সত্যানুসারীদের সাথে প্রকাশ্যে সংগ্রামে যখন অসত্যের পূজারীরা পেরে ওঠে না, তখনই ছদ্মবেশে তারা সত্যানুসারীদের দলে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চালায়।

মুজাহিদদের বিরুদ্ধেও তাই চলল। প্রকাশ্যে কোন লড়াইয়ে সুবিধা করতে না পেরে শঠতা ও মুনাফিকীর আশ্রয় নিল দুশমনরা। অবশ্য শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেব তাতে আদৌ ঘাবড়ালেন না। তাঁরা পেশোয়ারে আঘাত পেয়ে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করতে প্রয়াসী হলেন। এতদসত্ত্বেও মুনাফিকদের কাজ অব্যাহত গতিতে চলল। তারা শিখদের সাথে পূর্ণ যোগাযোগ রেখে ইসলামী হুকুমতের সবকিছুই তাদের অবহিত রাখতে লাগল। শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেবের চারদিকে ব্যাপক ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করা হলো। তাঁরা তা বুঝতে পেরে পূর্ণোদ্যমে চরম জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করলেন। রণজিৎ সিং ও বুধ সিং বারংবার মুজাহিদদের হাতে পরাজয় বরণ করে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এক্ষণে বিশ্বাসঘাতক

facebook/@maktabatuttalamij

পাঠানদের সহযোগিতায় তারা পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করল। মুজাহিদদের কোথায় কি অসুবিধা ও দুর্বলতা রয়েছে তা তারা মুসলমান বিশ্বাসঘাতকদের মারফত জানতে পেরে নিজেদের প্রয়োজনীয়রূপে প্রস্তুত করার সুযোগ পেল।

সৈয়দ সাহেব সাধারণত তালীম তাওয়াজ্জুহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাই শাহ্ ইসমাঈল একাধারে খিলাফতের কাজ সম্পাদন, মুজাহিদদের ট্রেনিংদান ও নতুন মুজাহিদ গড়ে তোলবার জন্য জায়গায় জায়গায় গিয়ে জিহাদের আবশ্যকতা সম্পর্কে বক্তৃতা দান করতেন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় পাঠানদের ভেতরে বিপুল জাগরণ দেখা দিল। হাজার হাজার পাঠান এসে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিল। যেসব পাঠান সর্দারেরা এ পর্যন্ত নীরব ছিল, তারাও জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এসে দীন ইসলামের ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হলো। মীর আলম নামে এক পাঠান সর্দার এতদিন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে শিখদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সেও শাহ সাহেবের বক্তৃতায় স্বগোত্রের ভেতরে ব্যাপক চেতনা দেখতে পেয়ে শহীদের গৌরব অর্জনের জন্য সদলবলে মুজাহিদ শিবিরে যোগ দিল।

জয়যাত্রা

ভূক্করে শাহ্ ইসমাইলের পরিচালিত মুজাহিদ বাহিনী শিখদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি 'রাজদুয়ারী' আক্রমণ করে অনায়াসে জয় করে ফেলল। তারপর 'সীহন' ও

facebook/@maktabatuttalamij

'ভূগড়' আক্রমণ করল। সামান্য যুদ্ধের পরে সে দুটো শহরও জয় করে ফেলল। এরপরে তারা 'বালাকোট' আক্রমণ করে জয় করে নিল। বালাকোট জয় করে মুজাহিদগণ অত্যন্ত উৎসাহ লাভ করল। সংগে সংগে গিয়ে মোজাফফরাবাদ আক্রমণ করল। তাও বিজিত হলো।

বালাকোটের যুদ্ধ

শিখ সেনাপতি শের সিং তখন পেশোয়ারে ছিল। মুজাহিদদের এই বিরাট জয়যাত্রা দেখে তার পিত্ত জ্বলে উঠল, বিবেক উড়ে গেল। সে তখুনি সসৈন্যে পেশোয়ার হতে অগ্রসর হলো এবং ভূগড় ও সীহুন পুনরুদ্ধারের মতলব আঁটল।

শিখদের এ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে শাহ্ ইসমাঈল অন্যান্য মুজাহিদদেরও ডেকে একত্রিত করলেন এবং শিখদের সাথে মুকাবিলা করার সব ব্যবস্থা স্থির করে ফেললেন। বালাকোট রক্ষার ভার দেয়া হলো সর্দার হাবিবুল্লাহ খান নামক জনৈক বীর যোদ্ধার হাতে। তারপর তিনি সৈয়দ সাহেবকে নিয়ে সীহুন ও ভূগড় রক্ষা করতে চললেন।

শের সিং যখন জানতে পারল যে, মুজাহিদরা অধিকাংশই ভূগড় ও সীহুনে সমবেত হয়েছে এবং বালাকোটের ময়দান প্রায় খালি রয়েছে, তখন সে বালাকোট আক্রমণ করাটাই সুবিধাজনক ভাবল। তাই সে বালাকোট আক্রমণের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে 'মাটিকোট' নামক স্থানে পৌছল।

facebook/@maktabatuttalamij

বালাকোট হাজারা জিলার পার্বত্য এলাকায় একটি টিলার উপর অবস্থিত। মাটিকোট এবং বালাকোটের মধ্যস্থলে পাহাড় বিদ্যমান। সেখানে তাড়াতাড়ি ঢুকবার কোন উপায় নেই। শিখরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও পাহাড় ডিঙিয়ে এসে সহসা মুজাহিদদের আক্রমণ করতে পারল না।

সর্দার হাবিবুল্লাহ খান শিখদের উপস্থিতির সংগে সংগে শাহ্ ও সৈয়দ সাহেবকে সংবাদ দিলেন। তাঁরা সংবাদ পেয়েই সীহন ও ভূগড়ে দু'দল মুজাহিদ রেখে বাকী মুজাহিদদের সংগে নিয়ে বালাকোট চলে এলেন। এবারে মুজাহিদরা পূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

শের সিং একেতো বালাকোট আক্রমণ করার কোন পথ পাচ্ছিল না, তদুপরি শাহ সাহেব ও সৈয়দ সাহেবের আগমনবার্তা পেয়ে সে আরও ঘাবড়িয়ে গেল। অগত্যা সে হতাশচিত্তে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

বিশ্বাসঘাতকরা দেখল, সর্বনাশ। মুজাহিদরাই তাহলে টিকে গেল? তারা গোপনে ছুটে গেল শের সিং–এর কাছে। শমশের আলী নামক এক মুসলমান গিয়ে শের সিংকে মোগলদের তৈরি এক গুপ্তপথের সন্ধান দিয়ে এল। সে পথ ছিল লতাপাতায় আবৃত। বুঝবার সাধ্যি ছিল না তা পথ বলে। মাত্র গুটিকতক লোক জান্‌তো সে খবর। তাই সে পথ সম্পর্কে মুজাহিদদের কোনই ভাবনা ছিল না। সে পথ যেন ওহুদের সেই সংকীর্ণ গিরিপথ। শাহ্ সাহেব ও সৈয়দ সাহেব তবুও সে পথ পাহারা দেবার জন্য আশিজন মুজাহিদ মোতায়েন রেখেছিলেন। কিন্তু তারা সে দায়িত্বের উপরে তেমন

facebook/@maktabatuttalamij

গুরুত্ব দেয় নি। কেননা মুজাহিদরা জানতে পারল যে শের সিং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যাচ্ছে। তাই আরও নিশ্চিন্ত হলো।

এদিকে শিখরা গুপ্তপথের সন্ধান পেয়ে অতর্কিতভাবে সেই পথে দলে দলে বালাকোটে ঢুকে পড়ল। মুজাহিদরা তখন প্রায় অপ্রস্তুত ছিল। যে যা সামনে পেল হাতে নিয়ে তাদের বাধা দিতে এগিয়ে চললো। সৈয়দ সাহেব নিষেধ করলেন। তিনি মুসলমানদের মীরজাফরী বুঝতে পারলেন। বিশ্বাসঘাতকরা ছাড়া এই গুপ্তপথের সন্ধান শিখেরা যে পেতে পারে না এটা তিনি বুঝলেন। তিনি স্বজাতির এহেন বিশ্বাসঘাতকতায় একদম ভেঙে পড়লেন।

শেষ পর্যন্ত সৈয়দ সাহেব নিজে শহীদ হবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করলেন। তখনও অগ্রগামী শিখ ও মুজাহিদদের মধ্যে একটা খরস্রোতা খাল বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। সৈয়দ সাহেব 'আল্লাহু আকবর' বলে সে খালে ঝাঁপ দিয়ে দেখতে দেখতে পার হয়ে গিয়ে শিখদের বিরাট বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। শাহ্ সাহেবও তাঁকে অনুসরণ করলেন। শুধু এই দুই বীর মুজাহিদই বেশ কিছুক্ষণ অবধি শিখদের সাথে বিপুল বিক্রমে লড়ে চললেন। তাঁদের তরবারীর প্রচণ্ড আঘাতের মুখে বহু শিখের গর্দান উড়ে গেল। যেদিকেই তাঁরা অগ্রসর হন, সেদিকেই শত্রু শূন্য হয়ে যায়। কেউ তাঁদের সামনে এগোতে সাহস পেল না। শুধু দূর থেকে অজস্রধারায় তীর ছুঁড়ে চললো। এ যেন দ্বিতীয় কারবালা।

ওদিকে মুজাহিদরা বসে রইল না। তারাও সেই খরস্রোতা নহর পেরিয়ে শিখদের হামলা শেষ পর্যন্ত রুখতে ছুটে এল। কিন্তু খাল পেরিয়ে যখন তারা এসে পৌছল, তখন আর সৈয়দ সাহেবকে খুঁজে

facebook/@maktabatuttalamij

পেল না। আর শাহ্ ইসমাঈলকে দেখতে পেল তাঁরা শাহাদতের খুনে রঞ্জিত হয়ে ধরণীর বুকে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছেন। গোটা শরীর তাঁর তীরের আঘাতে চালুনীর মত ছিদ্র হয়ে গেছে। খলীফা গায়েব আর সিপাহসালার শহীদ। আর লড়ে কি লাভ? হতাশায় মুজাহিদরা মুশ্ড়ে পড়ল। তাদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেল। বাকী যারা ছিল, তারা শাহাদত বরণ করে ধন্য হলো।

এভাবে মুসলমান নামধারী পাপিষ্ঠ সীমার ও মীরজাফর দলের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থে আত্মোৎসর্গকারী মুজাহিদ দল বালাকোটের ময়দানে শহীদী খুনের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করলেন। আর সে ঝর্ণাধারাই কালে উপমহাদেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়ে সৃষ্টি করল জাতীয় জাগরণের এক মহাপ্লাবন।

বালাকোটের সে হৃদয়বিদারক ঘটনা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে শুক্রবার ঘটে। বলা বাহুল্য, বালাকোটের পতনের সাথে সাথে ইসলামী হুকুমতের যে দ্যুতি উপমহাদেশের বুকে চমকে উঠেছিল, বিদ্যুতের মত তা আকাশে মিলিয়ে গেল। তবে তার পদচিহ্ন অনুসরণ করেই গড়ে উঠল মুসলিম রেনেসাঁ বা মুসলিম জাগরণ। যার পরিণতি আজকের পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

শাহ্ সৈয়দের মাযার

বালাকোট প্রান্তরেই শিখরা সে বীর শহীদদ্বয়ের লাশ দাফন করে যায়। মুজাহিদরা গিয়ে সৈয়দ সাহেবকে দেখতে পায়নি বলে ধারণা করেছিল যে, তিনি হযরত ঈসা (আ)–র মত গায়েব হয়ে গেছেন।

facebook/@maktabatuttalamij

মূলত তা ঠিক নয়। তাঁদের উভয়ের মাযারই বালাকোটে বিদ্যমান রয়েছে।

শাহ সাহেবের মর্তবা

শাহ্ ইসমাইল শহীদ মরেও অমর হয়ে আছেন। যতদিন উপমহাদেশে একটি মুসলমানও থাকবে, ততদিন তিনি সম্মানের সাথেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কারণ তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছেন উপমহাদেশের দুর্গত মুসলমানদের মুক্তির জন্য আর আল্লাহ্র দীনের জয় পতাকা তুলে ধরার জন্য। তাই তাঁর সে অমর সাধনা তাঁকে দোজাহানের সাফল্য এনে দিয়েছে। তিনি তাঁর পিতামহ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর সাধনাকে পূর্ণরূপ দেয়ার প্রচেষ্টা করে গেছেন। সে জন্যে এমন কি স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। যে যুগে তিনি তার মুজাহিদ আন্দোলন ও ইসলামী হুকুমতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, সেটা ছিল মুসলমানদের ভয়ানক দুর্দিন। তিনিই তাদের মুক্তি সাধনার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে আযাদীর পথ দেখিয়ে গেলেন।

চরিত্র

শাহ্ সাহেব ছিলেন নেহায়েত সরল প্রকৃতির লোক। শরীয়তের ব্যাপারে ছিলেন তিনি অত্যন্ত সতর্ক। আল্লাহ ও রসূলের ইংগিতের বিন্দুমাত্র এদিক–ওদিক দেখলে তিনি তা সহ্য করতেন না। একটা সাধারণ ঘটনার মাধ্যমে যে কেউ তা বুঝতে পারবে। একদা সৈয়দ আহমদ বিশেষ কারণে ফজরের নামাযে হাযির হতে কিছুটা বিলম্ব

facebook/@maktabatuttalamij

করে ফেললেন। শাহ সাহেব খলীফা হিসেবে তাঁকে আদৌ ছেড়ে দিলেন না। সাথে সাথে মসজিদে বসেই তাঁর কৈফিয়ত তলব করলেন। কেননা, আল্লাহ্র বিধানের বেলায় যে কোন ব্যক্তিকে অবাধে কৈফিয়ত তলব করা যায়। সৈয়দ সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করে তওবা করলেন। তারপরে শাহ্ সাহেব শান্ত হলেন।

উপস্থিত বুদ্ধিতে শাহ্ সাহেবের জুড়ি মেলা ভার ছিল। তিনি যে কোন অবস্থায় যে কোন মাস'আলার জবাব দিতে পারতেন। আর ঝটপট যা বলে দিতেন, তা মনে হত যেন বহু ভেবে-চিন্তে আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। একদা তিনি সৈনিকের পোশাকে সেজে এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে কুরআন ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠ মাজছিলেন। এমন সময় একদল আলিম এসে একটি জটিল মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। তারা অবশ্য শাহ্ সাহেবকে এ অবস্থায় দেখে মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু শাহ্ সাহেব প্রশ্ন করা মাত্রই সঠিক জবাব দিয়ে দিলেন। তাঁরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কিতাব না দেখে মুখে মুখে এভাবে মাস'আলার উত্তর দিলেন কি করে?" শাহ্ সাহেব জবাব দিলেন ঃ "আমার সাথে কুরআন আছে। সকল প্রশ্নের উত্তর আমি তা থেকে দিয়ে থাকি। আমার সাথে তরবারিও আছে। কুরআনের মীমাংসা যার পছন্দ না হয়, তার মীমাংসা তরবারী দ্বারাই করে থাকি। তাই কিতাবের আর দরকার হয় না।"

ব্যক্তিগত সুযোগ–সুবিধা বা আরাম–আয়েশের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল না আদৌ। পার্থিব স্বার্থের যে কোন বিরাট প্রলোভনও আকৃষ্ট

facebook/@maktabatuttalamij

করতে পারেনি তাঁকে কখনো। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র দীনের বিজয় কেতন উর্ধ্বে উড্ডীন করা। সে ব্যাপারে যে যত সাহায্য করত, তা তিনি অকুণ্ঠে গ্রহণ করতেন। যেমন সীমান্ত এলাকার বহু সর্দার তাঁকে এ কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য দান করত এবং তা তিনি সানন্দে গ্রহণ করতেন। টঙ্কের নওয়াবও তাদেরে এ ব্যাপারে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দান করেছিলেন। তিনি শাহ সাহেব ও সৈয়দ সাহেবের নেহায়েত ভক্ত ছিলেন।

রণজিৎ সিং যখন বারবার তাঁদের হাতে পরাজয় বরণ করতে লাগল, তখন লোক মারফত শাহ্ সাহেবের কাছে প্রস্তাব পাঠাল যে, যদি তাঁরা যুদ্ধ থেকে বিরত হন, তা হলে তাঁদেরকে এক বিরাট এলাকার জমিদারী দান করা হবে। শাহ্ সাহেব ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সাথে সাথে রণজিৎ সিংকে জানিয়ে দিলেন, "আমরা আল্লাহ্র নামের বিজয় কেতন উড্ডীন করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছি, জমিদারী দখল করার জন্য নয়। তাই তুমি যদি আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার কর তা হলে তোমার সাথে আমাদের আর কোন ঝগড়া থাকবে না।" আসলে এটাই হলো আল্লাহ্প্রেমিক মুজাহিদদের কথা।

শাহ্ সাহেবের শিক্ষা

শাহ্ সাহেবের শিক্ষার মূল মন্ত্রই ছিল মুসলমানদের আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী করে তোলা ও শিরক বিদ'আত ইত্যাদি কুসংস্কারের হাত থেকে তাদের মুক্ত করা। বিশেষত কুরআন-হাদীসকে যেন মুসলমানরা জীবনের একমাত্র কার্যসূচী মনে করে অনুসরণ করতে

facebook/@maktabatuttalamij

থাকে, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীদের হুবহু নমুনারূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ দীর্ঘদিন ধরে ভারতের মুসলমানরা বিজাতির সংশ্রবে থেকে তাদের অনেক কুসংস্কারকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেছে। তাতে ইসলামের মৌলিক ভিত্তিই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। পীরপূজা, দরগা–মাযার পূজা, ফকীরদের কাছে মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা, মানুষের নামে মানুষের কোন কিছু মানত করা, মানবের নামে শপথ গ্রহণ করা বা কোন কিছু কুরবানী করা ইত্যাদি প্রথা হিন্দু ধর্ম থেকে আমদানী করা হয়েছে। অথচ এগুলো ইসলামের মৌলিক আদর্শের ঘোর পরিপন্থী! হিন্দুরা মঠ রচনা করে ফুল চন্দন দিত, মুসলমানরাও দরগা–মাযারে ফুল ও বাতি দিয়ে তা অনুকরণ করছে। তাদের মঠে থাকে গোশাই মোহান্ত আর মুসলমানদের দরগায় থাকে ফকীর–খাদেম, এই যা পার্থক্য। তাই, যে পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ্‌কে উপাস্য না ভাববে এবং এসব ভণ্ড 'উসিলা' পথের মাঝ থেকে বিদায় দিয়ে নিজেরা সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ স্থাপন না করবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের শান্তি ও মুক্তি সুদূরপরাহত।

তিনি আরও বলেন, "মুসলমান কখনও অপরের গোলামী করতে কিংবা অপরের অনুকরণ করতে দুনিয়ার বুকে আসে নি। তারা এসেছে দুনিয়ার মানুষকে নেতৃত্ব দিতে, আদর্শ দিতে আর দিতে চির শান্তি ও মুক্তিপথের সন্ধান। তারা বশ্যতা স্বীকার করবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র। দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে প্রাণ থাকতে তারা মাথা নত করবে না। আর যেহেতু মুসলমানরা হলো দুনিয়ার বুকে

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লাহ্‌র বাহিনী, তাই তাদের কাজ হবে পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করা। সে জন্য তারা যত মানুষ প্রভু রয়েছে, তাদের আসন মিসমার করে ধূলায় লুটিয়ে দেবার জন্য আমরণ জিহাদ করবে।"

যখন তাঁর চাচা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী জিহাদের জন্য এক ফতোয়া জারি করলেন, তখন থেকেই শাহ্ ইসমাঈল জিহাদের প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। শাহ্ আবদুল আজিজের ফতোয়া নিম্নরূপ ছিল ঃ "যদি কোন অমুসলিম শক্তি মুসলমানদের উপর শাসনক্ষমতা লাভ করে এবং রাজকীয় ক্ষমতা মুসলমানদের ইসলামী কার্য সম্পাদনে যে কোন ক্ষেত্রে বাধাদান করে তাহলে মুসলমানদের পক্ষে জিহাদ করা ফরয হয়ে দাঁড়ায়।

এই ফতোয়ার পরে কেবলমাত্র ইংরেজদের খাস দালাল ও শিখ মারাঠাদের এজেন্টরা ছাড়া সকল মুসলমানই জিহাদের জন্য প্রস্তুতি শুরু করল। সারা ভারতের বুকে এর জাদুকরী প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল। গোটা দেশে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেদিন শিখ-ইংরেজ-মারাঠাচক্র তাই প্রমাদ গণল।

গ্রন্থাবলী

যৌবন থেকেই তিনি রীতিমত প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করেন ও পরে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতে তিনি অনেক বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র ছাপা হয়েছে। আর বাকীগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। নীচে তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থ ক'টির পরিচয় দেয়া গেল।

facebook/@maktabatuttalamij

তাকভীয়াতুল ঈমান

এই বইয়ের কিছু পরিচয় আগেই দেয়া হয়েছে। উর্দু ভাষায় প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠায় রচিত এ গ্রন্থে মুসলিম সমাজের সকল প্রকার কুসংস্কারকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র আলিম ও পীর ছাড়া কেউ ধর্ম বুঝতে পারে না সে ভুল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় শাহ্ সাহেব নিজেই লিখেছেন এবং বাকী অধ্যায়গুলো তাঁর উপদেশ মোতাবেক তাঁর শাগরিদ মুহাম্মদ সুলতান লিখে দিয়েছেন। মোট কথা ঈমানকে বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি খুবই অপরিহার্য।

রিসালায়ে একরোযাহ

তাকভীয়াতুল ঈমান প্রকাশ হবার সাথে সাথে ভণ্ড পীর ও আলিমদের তরফ থেকে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করা হলো। তাঁরা আদাজল খেয়ে শাহ্ সাহেবের বিরুদ্ধে লেগে গেলেন। শাহ্ সাহেব তখন একটি দৈনিক পত্রিকা বের করে তাদের সকল প্রতিবাদ ও অভিযোগ খণ্ডন করতে লাগলেন। এগুলোকেই পরে একত্রিত করে 'রিসালায়ে একরোযাহ' নামক গ্রন্থে রূপ দেয়া হয়।

মনসবে এমামত

এই বই সম্পর্কেও এর আগে বলা হয়েছে। সৈয়দ আহমদের নামে খুতবা পাঠের ব্যাপার নিয়ে ভণ্ড পীর ও মোল্লারা যে হৈ চৈ শুরু করেছিল, তার জবাব দেয়া হয়েছে এ কিতাবে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে, যা পড়ে সবাই বিস্ময়ে চুপচাপ হয়ে গেল। তাতে

facebook/@maktabatuttalamij

তিনি মুসলমানের খলীফা হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্তের উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, সৈয়দ সাহেবের ভিতরে তার প্রত্যেকটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। এটাও উর্দু ভাষায় লেখা হয়েছে।

অসুলে ফিকাহ

এ গ্রন্থখানা লেখা হয়েছিল আরবী ভাষায়। তাতে ইসলামের মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে।

সিলকে নূর

শাহ্ সাহেব মাঝে মাঝে কবিতাও লিখতেন। তবে তা–ও প্রায়ই ধর্ম বিষয়ক ছিল। উর্দুতে তিনি একটি মসনবী লেখেন। তার নাম দেয়া হয় সিলকে নূর (জ্যোতির মালা)।

সন্তান-সন্ততি

শাহ্ ইসমাঈলের একটিমাত্র সন্তান ছিল। তাঁর নাম মুহাম্মদ ওমর। তিনি শাহ্ সাহেবের শাহাদত লাভের পরেও বিশ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থাতেই তিনি পরলোকগমন করেন।

ইফাবা --১৪-১৫--প্র/৪০১২(উ)-৩২৫০

facebook/@maktabatuttalamij